চেনা মানুষ অচিন মন

অনিরুদ্ধ রাহা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

মন্ত্রশক্তি অথবা কুমড়ো ফুলের অ্যাখ্যান	১১
উত্তরাধিকার	২৯
অন্তর্লীনা	৪৩
মাধবীলতা ও মহোঞ্জোদাড়ো	৫৩
স্বনির্বাসন	৬৭
মেলাওয়ালা এবং অন্য একটি গল্প	৭৫
অন্তরাল	৮৯
ভয়	১০৭
বইহার ও বীজবাবু	১১৯
বন্ধু	১২৯
অন্তরতর	১৩৭
অপরিচিত	১৪৭

মন্ত্রশক্তি অথবা কুমড়ো ফুলের আখ্যান

কুমড়ো ফুলের বড়া ভেজে ভাতের থালা সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকে শেফালি। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ওইটুকুই তো বিলাস পরেশের। সারাদিন দারিদ্রের সাথে লড়াই করে ওই রাতটুকুতেই তো তারা পরস্পরকে উজাড় করে দেয় তাদের সবটুকু। ভালোবাসায় ডুবে যেতে যেতেও কী যেন একবেদনা শেফালির বুকে। পরেশকে সে দিতে পারেনি সন্তান।

অভাবের সংসারে সুখের ছোঁয়া আনতে দিন মজুরের কাজ করার জন্য ঠিকাদারের সঙ্গে দূর দেশে যায় পরেশ। নিঃসঙ্গ যুবতীকে সাহায্যের অছিলায় শুরু হয় নারাণ মুদীর আনাগোনা। ভয় পেয়ে যায় শেফালি। চলে যায় দাদার বাড়ি। প্রতিবেশী ঘোষগিন্নির নাতি হয় কপালের কাছে তার সাপের ফণার মতো মাংসপিণ্ড। গ্রাম গ্রামান্তরে রটে যায় মা মনসার আশীর্বাদ ধন্য শিশুর জন্মের কথা। ঘোষবাড়িতে জমতে থাকে প্রণামীর পাহাড়। শেফালি ভাবে, অমন একটা সন্তান হলে মানুষ ছুটে আসবে তার ঘরেও। প্রণামীর টাকায় ঘুচে যাবে অভাব। দুখনী দাইকে ধরে পড়ে শেফালি। শেফালিকে সে নিয়ে যায় ভৈরব-এর আশ্রমে, শরীর ও মনের মন্ত্রশুদ্ধি হওয়া চাই। ধূপ, ধুনো, গুগগুলের গন্ধ আর ঝাঝাল পানীয়। বুঁদ হয়ে যায় শেফালি... এগিয়ে চলে দারিদ্র, ভালবাসা, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের গল্প...

ছোট্ট একটুখানি মাচা। তাতেই লতলতিয়ে বেড়ে উঠেছে কুমড়ো গাছটা। সাপের ফণার মতো তেজি ডগাগুলোর ঝলমলে সবুজের সঙ্গে উজ্জ্বল হলুদ ফুল। মনটা খারাপ হয়ে যায় শেফালির। ওদের ঘরের পাশে মাচাতেও ধরেছিল এমনই ফুল। চারটে ফুল পেড়ে বড়া ভাজবে ভেবেছিল শেফালি। সে মানুষটা ঘরে ফিরলে দুটো ভাত আর গরম গরম বড়া ভাজা বেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকবে ভেবেছিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠতো পরেশের মুখ। কুমড়ো ফুল ভাজা তার বড়ো প্রিয়। অবাক হয়ে তাকাত শেফালির দিকে। প্রথমে চোখে চোখ রাখতই না সে মেয়ে। তারপর যখন দুগাল খেয়ে পরেশ বলত, 'কুমড়ো ফুলি বড়ো সোয়াদ... ', তখন ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি মেখে চোখের পাতা অল্প তুলে একবার চোখে চোখ রাখবে শেফালি। কেরোসিন ল্যাম্পের নিবু নিবু আলোয় চোখে চোখ মিলতেই বুকের ভেতর উথাল-পাতাল। খাওয়া সেরে পরেশ ঘরের বাইরে গেলে কোনোমতে দুটি ভাত মুখে গুঁজে হাত মুখ ধুয়ে আসতে যেটুকু সময়। ততক্ষণে চৌকিতে আধশোয়া হয়ে বিড়িতে দু'টান দিয়েছে পরেশ। ও ঘরে ঢুকতেই বিড়িটা নিবিয়ে ফুঁ দিয়ে ল্যাম্পটা নিবিয়ে পরেশ ডাকবে 'বউ... '। তারপর তো,... লজ্জায় লাল হয়ে যায় শেফালি।

মন খারাপ হয়ে যায় শেফালির। সরষের তেল ছিল না ঘরে। পয়সাও নেই তেমন। পায়ে পায়ে নারাণ মুদির দোকানে গিয়ে দাঁড়ায়। সামনে দাঁড়ানো তিন চারজনের মাথা ছাড়িয়ে আড়চোখে ওকে একবার দেখে নেয় নারাণ। সামনেটা ফাঁকা হতে মাথা নীচু করে নারাণের বসার চৌকিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

'কী চাও... ?'

চোখ তুলে তাকায় শেফালি। নারাণের চোখ তখন স্থির হয়ে রয়েছে সুডৌল বুকদুটোয়। অস্বস্তিতে আঁচলটা আরও টানে শেফালি। ইতস্তত করে বলে, 'একটুন তেল....'

'পয়সা?'

ঘাড় নাড়ে শেফালি। মাথা নীচু করে বলে, 'পয়সা আনলি দে যাবো... '

'পয়সা আনলি... ' হেসে ওঠে নারাণ, তেল নেবে নাও না... গৌর, যতটা চায় ওরে তেল দে... '

সারাটা শরীর চোখ দিয়ে চেটেপুটে খাচ্ছিল নারাণ মুদি। তবু তেলটুকু এনেছিল শেফালি। আনতেই তো হয়, তেল না হোক নুন, নুন না হোক হলুদ, আলু, ডাল বা চাল। কিছু না কিছু তো বাড়ন্ত এ গাঁয়ের অনেক ঘরেই। সুতরাং ধার বাকি চলতেই থাকে আর নারাণ মুদির রসনা তৃপ্তির উপাদানও মিলতেই থাকে।

সামান্য ব্যাসন বাটিতে গুলে কুমড়ো ফুলগুলোয় মাখাতে থাকে শেফালি। এখনই এসে পড়বে মানুষটা। সেই কোন্ ভোরে দুটো পান্তা খেয়ে জন খাটতে যায়। তারপর সূর্য মাথায় উঠলে বাবুদের ওখানে একরোজ ভাত, ডাল, পেঁয়াজ। তারপর, এই ঘরে ফিরে শেফালির বেড়ে দেওয়া ভাত। পরেশ ঘরে না থাকলে দিনমানে তো রাঁধেই না শেফালি। কী হবে একার জন্যে রান্না করে? ওই পান্তাই দুমুঠো খেয়ে রাতের অপেক্ষা।

তবে পরেশের কাজ থাকে না সারা মাস। চাষের সময়ে তো তবু কাজ পায়, তা বাদে সারা বছর এটা ওটা চেষ্টা। পরেশ ঘরে থাকলে রাঁধতে ইচ্ছে হয় শেফালির। হয়তো একটু পোস্ত জোগাড় হল, মাচা থেকে লাউশাক, কুমড়ো শাক, যখন যা। তাতেই খুশি পরেশ। ভারি ভালো লাগে শেফালির। খুব ইচ্ছে করে মানুষটার জন্যে আরও আরও রাঁধতে। সেবার ঝড়ের পর ছুটতে ছুটতে এল বিন্তি। 'মাসি ও মাসি দাসবাগান যাবি?' মা মরা মেয়েটার বড্ড নোলা। ঝড়ের পর এটা সেটা পড়ে দাসবাবুদের বাগানে। বাবুরা সব থাকে কলকাতায়। ন মাসে ছ মাসে এক আধবার গাঁয়ে। সারা বছর বাড়ি বাগান পাহারা দেয় বুড়ো সনাতন। তিনকুলে সব মরে হেজে গেছে। কোন্‌কালে নাকি দাসবাবুদের কলকাতার ব্যবসায় কী কাজ করত। এ গাঁয়ে বউ হয়ে আসা তক শেফালি তাকে দেখছে বাগান পাহারায়। ঝড়ে এটা সেটা পড়লে সেসব নিতে বাধা দেয় না সনাতন। হাঁক ডাক করে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় তার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়।

বিন্তির কথা ফেলতে পারে না শেফালি। আপনার বলতে তো পরেশের একটা বোন। কোনো ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে কার সঙ্গে কোথায় যেন চলে গেছে। সে কথা বিয়ের পর শেফালিকে বলেছিল পরেশই। বলেছিল আর কেঁদেছিল, '... কী বলবো তারি? খাতি দিতি পারি না... একন তবু খায়ি পরি আছে... '। বোনের কথা আর জিজ্ঞাসা করে না শেফালি। আপনার বলতে এখন ওই ক'ঘর প্রতিবেশী। বিন্তির কথা তাই ফেলতে পারে না শেফালি। খেতে বড়ো ভালোবাসে মেয়েটা। মা মরে যেতে আর দুটো ছোটো ভাই বোন আর ঠাকুমা। সে বুড়ি আবার বাতে পঙ্গু, চোখে দেখে না। কোনোরকমে দুবেলা দুমুঠো চাল ফোটাতেই কাতরায় বুড়ি, তো বিন্তিকে রেঁধে খাওয়াবে কে? বাবা বেরিয়ে যায় সেই সকালে, রাতে যখন ফেরে নেশাতে নেশাতে সে মানুষ আর ভাতের থালায় বসার অবস্থাতেও থাকে না। ওই মাসির কাছেই এটা সেটা আবদার। ঝড়ের পর দাসবাগানের সবুজ ঘাসের ওপর রাশি রাশি সজনে ফুল দূর থেকে দেখলে ঠিক যেন তুষারপাতের ছবি। অমন ছবি ছোটোবেলায় দেখেছে শেফালি। এমনিতে তো ওদের বাড়িতে ক্যালেন্ডার-এর ব্যবহার ছিল না কোনো। কিন্তু ওর বড়দা একসময় কেষ্টনগর লোকালে ক্যালেন্ডার বিক্রি-করত। তখন ওদের ঘরে অনেক রাধাকৃষ্ণ, কালীঠাকুর, লক্ষ্মীঠাকুর, শিবঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ছিল কত সব মানুষের ছবি। তাদের নাম জানে না শেফালি। তবে বড়ো বড়ো মানুষ সব। না হলে কি আর ক্যালেন্ডারে ছবি ছাপে? আর ছিল কিছু ফুলের ছবি, পাখির ছবি, সুন্দর সুন্দর জায়গার ছবি। সেখানেই তো শেফালি দেখেছে বরফ পড়ে থাকার ছবি।

ঠিক যেন বরফ পড়ে আছে দাসবাগানে। ছুটে যায় ছোট্টো মেয়েটা। বিন্তি ততক্ষণে দুহাত ভরে ফেলেছে সজনে ফুলে। আঁচল পেতে ফুল নিচ্ছিল শেফালি। বুড়ো সনাতন এসে দিয়ে যায় একটা ছোটো লাউ। লাউটা নামিয়ে রেখেই গম্ভীর মুখে হনহন হাঁটতে থাকে সনাতন। দুটো কথা বলার সুযোগ হয় কদাচিৎ।

লাউঘন্ট আর সজনে ফুল চচ্চড়ি দিয়ে সেদিন বিন্তির মহাভোজ। খেয়ে দেয়ে হাত চাটতে থাকে মেয়েটা। মায়ায় চোখে জল আসে শেফালির। বিয়ের পর তিন বছর পার

হয়ে গেছে, পোয়াতি হয়নি সে। পরেশও মহাখুশি সে রাতে। চেয়ে চেয়ে খায় সজনে ফুল চচ্চড়ি। খাওয়া দাওয়ার পর আলো নিবলে গভীর সুখে তলিয়ে যেতে যেতেও কি যেন এক না পাওয়া বাসা বাঁধে বুকের নিভৃতে। শেফালির তো আর সবকিছু বুঝতে পারার ভাষা জানা নেই।

সেদিনও তো, ব্যাসন মাখিয়ে কুমড়ো ফুল ভাজতে যাবে শেফালি। হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল পরেশ। 'চাট্টি ভাত দে... এখনই যাতি হবে।' যাতি হবে? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শেফালি। মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসে পরেশ। 'ভালো কাজ পাইছি... এখনই যাতি হবে মুম্বাই... '

মুম্বাই? নির্বাক চেয়ে থাকে শেফালি। কোনোরকমে নাকে মুখে গুঁজতে গুঁজতে পরেশ জানায়, ঠিকাদারের কাজ, অনেক বাড়িঘর হচ্ছে সেখানে। মাটি খোঁড়া থেকে ঢালাই পর্যন্ত অনেক কাজ। ঠিকাদারের সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে। সন্ধে সাড়ে সাতটার লোকাল ধরলে সাড়ে নটার মধ্যে কলকাতা। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন। রোজ কাজ, অনেক টাকা। কী খেলো, না খেলো দেখলই না মানুষটা। কোনোরকমে পুঁটুলিতে লুঙ্গি, গামছা নিয়ে পাঁচশোটা টাকা দিল শেফালির হাতে। 'কটা দিন চালা, তারপর পোস্টাপিসে পাঠাবানে।' ঘর ছেড়ে ঘর গড়তে গেল মানুষটা।

বুকের ভেতর বাসা বাঁধা না পাওয়াটা কুরে কুরে খায়। মাসের পর মাস যায়, ঘরের মানুষটা ঘরের বাইরে। পোস্ট অফিসে টাকা আসে। যা আসে তাতে কষ্টসৃষ্টে চলে যায় বটে কিন্তু ওই কটা টাকার জন্যে ঘরের মানুষ ঘরে না ফেরার দুঃখটা যায় না। মাঝে একবার এসেছিল পরেশ। কী চেহারা হয়েছে। কেঁদেই ফেলে শেফালি। 'খাওয়ার কষ্ট খুব না গো?' বলতে চায় না মানুষটা। খুব পীড়াপিড়িতে বলে, 'তা আছে একটুন...।' 'খাটালি খুব?' সম্মতিতে মাথা নাড়ে পরেশ। 'তোমারি আর যেতি দিব না।' 'তা বললি হয়.:. আর কদিন দেখি...।' একটা বিড়ি ধরায় পরেশ। ওর বুকে মাথা রাখে শেফালি। বুকের ভেতর কেমন সাঁই সাঁই আওয়াজ। ভয় পেয়ে মাথা তোলে শেফালি। 'ও কিছু না... সারাদিনমান রোদি রোদি কাজ... ঠান্ডা গরমি একটুন... '

মন মানে না শেফালির। দিন চারেক থেকে চলে যায় পরেশ। চলে যেতে হয়। ফাঁকা ঘরে মন বসে না। এরই মধ্যে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আসে নারাণ মুদি। থতোমতো খেয়ে আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে মাথা নীচু করে বলে, 'পয়সা তো কিছু বাকি নাই...।' হেসে ওঠে নারাণ, 'পয়সা ছাড়া কি আর কুনো সম্পক্ক নাই?... তাগাদায় বেরিয়ে তুমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতি যেতি ভাবলাম একটা খপর নে যাই... পরেশটাও ঘরে নাই... একা সোমত্ত মেইয়েমানুষ... দিনকাল ভালো না... আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আচে না কী?' উত্তর দেয় না শেফালি। আরও কিছু সময় দাঁড়িয়ে দুচোখ দিয়ে ওর শরীরটা জরিপ করে নারাণ বলে, 'কুনো লজ্জা নেই, ঝা ঝ্যাখন লাগবে মুখ ফুটি চাইলিই পাবে... আমি তো আপনজন না কী?' সে রাতে বিস্তিকে নিজের কাছে রাখে শেফালি। দুদিন পর পোস্ট অফিসের পিওনকে বলে আসে টাকা এলে রেখে দিতে।

বাপের বাড়ির গাঁয়ে মায়ের কাছে চলে আসে শেফালি। হাতের কটা টাকা বউদিকে

দিতে খুশিই হয় কমলা। স্টেশনের ধারের দোকান থেকে দাদার ছেলে মেয়ের জন্য এনেছিল গাড়ি আর পুতুল। সে দুটোতে তো আর পিসির কাছছাড়া হতেই চায় না। চোখ মটকে কমলা বলে, 'ঠাকুরঝি, ইবার তো ঠাকুরজামাই-ইর বংশরক্ষে করতি হয়...' লজ্জা পায় শেফালি। বুকের ভেতর নড়ে চড়ে না পাওয়াটা।

এতদিন পর মেয়েকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা মা। ঢেঁকি শাক বাছতে বসে বুড়ি। রাতে বাড়ি ফিরে দাদা উপহার দেয় একখানা বড়ো চিরুনি। 'কেষ্টনগর লাইনে এ চিরুনির এখন খুব ডিমান... আমি ছাড়া এতো দামি মাল রাখে না কুনো হকার... '

ভালোই কাটে কটা দিন। সেদিন সকালে বউদির রান্নাঘরের পাশে মাচায় কুমড়ো ফুল দেখে মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। কুমড়ো মাচার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শেফালি, অন্যমনস্ক।

'ঠাকুরজামাই-র কতা ভাবতিছ?'

শেফালির কাঁধে ঠেলা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে কমলা।

লজ্জা পায় শেফালি। ওর হাত ধরে কমলা বলে, 'চল... '

'কুথা?'

'দুখনী দাই-এর ঘর'

'দাই!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ... আমাদের পাশির ঘরির ঘোষগিন্নির ছেলির বউ পুয়াতি। বড়ো দুখী মেয়ে... মা বাপ কেউ নাই। শাঁখা পলা পরায়ি এক কাপড়ি তারি ঘরি নিল ঘোষগিন্নি। বছর না ঘুরতেই কোল ভারী... ঘোষগিন্নি বললে দুখনী দাইরে খপর দিতি... চল,' কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে কমলা বলে, 'তুমারি নে যাচ্ছি কেন জানো?'

'কেন?'

'দুখনী দাই জড়ি বুটি ওষুধি জানে অনেক... ঠাকুরজামাই-এর বংশধর আনতি হবে কিনা?'

'জড়ি বুটি... '

'চল চল... '

সব শুনে দুখনী বলল, 'পুরো ২৫১ ট্যাকা, ৫ কিলো চাল, ২ কিলো ডাল, ২ কিলো আলু আর লতুন কাপড়... তা বাদ, ছেল্যা হলি ঘড়া আর মেইয়ে হলি গামলা'

পথে আসতে আসতে কমলা তাকে জানাল শেফালির কথা। অশ্বগন্ধার শিকড় জলে সেদ্ধ করে অল্প ঘি আর দুধের সঙ্গে রোজ রাতে পান করার নিদান দিল দুখনী দাই।

ঘোষবাড়ি পৌঁছে ঘোষগিন্নি ছেলের বউকে দেখে দুখনী বলে, 'লাতি হবে গো মা ঠাকরুন... ছেল্যা হবে, ছেল্যা... '

'ভালো করি দ্যাকো দাই... বেটার বেটা হলি তোমারে খুশি করি দেবানে... '

'দুখনী দাই প্যাডে হাত দিলিই সব বুঝতি পারে গো মা জননী... লাতির মুখ দেখাবানে, ঘড়া নেবানে, তারপর আমার ছুটি'